খুঁজি খুঁজি নারি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১. রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে ব্যোমকেশের পরিচয় 2
০২. রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে 7
০৩. রামেশ্বরবাবুর মৃত্যু-সংবাদ 16
০৪. রামেশ্বরবাবুর উইল 29

০১. রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে ব্যোমকেশের পরিচয়

রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে ব্যোমকেশের পরিচয় প্রায় পনেরো বছরের। কিন্তু এই পনেরো বছরের মধ্যে তাঁহাকে পনেরো বার দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। শেষের পাঁচ-ছয় বছর একেবারেই দেখি নাই। কিন্তু তিনি যে আমাদের ভোলেন নাই তাহার প্রমাণ বছরে দুইবার পাইতাম। প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ ও বিজয়ার দিন তিনি ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতেন।

রামেশ্বরবাবু বড়মানুষ ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার আট-দশখানা বাড়ি ছিল, তাছাড়া নগদ টাকাও ছিল অপর্যাপ্ত; বাড়িগুলির ভাড়া হইতে যে আয় হইত। তাহার অধিকাংশই জমা হইত। সংসারে তাঁহার আপনার জন ছিল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুমুদিনী, প্রথম পক্ষের পুত্র কুশেশ্বর ও কন্যা নলিনী। সবোপরি ছিল তাঁহার অফুরন্ত হাস্যরসের প্রবাহ।

রামেশ্বরবাবু হাস্যরসিক ছিলেন। তিনি যেমন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন তেমনি হাসাইতেও পারিতেন। আমি জীবনব্যাপী বহুদর্শনের ফলে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলাম যে, যাহাদের প্রাণে হাস্যরস আছে তাহারা কখনও বড়লোক হইতে পারে না, মা লক্ষ্মী কেবল প্যাঁচাদেরই ভালোবাসেন। রামেশ্বরবাবু আমার আবিষ্কৃত এই নিয়মটিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। অন্তত নিয়মটি যে সার্বজনীন নয় তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

রামেশ্বরবাবুর আর একটি মহৎ গুণ ছিল, তিনি একবার যাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেন তাহাকে কখনও মন হইতে সরাইয়া দিতেন না। ব্যোমকেশের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল তাঁহার বাড়িতে চৌর্য ঘটিত সামান্য একটি ব্যাপার লইয়া। ব্যাপারটি কৌতুকপ্রদ প্রহসনে সমাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তদবধি তিনি ব্যোমকেশকে সস্নেহে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কয়েকবার তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণও খাইয়াছি। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন, শেষ বরাবর তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু হাস্যরস যে তিলমাত্র প্রশমিত হয় নাই তাহা তাঁহার ষান্মাসিক পত্র হইতে জানিতে পারিতাম।

আজ রামেশ্বরবাবুর অন্তিম রসিকতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। কয়েক বছর আগে; তখন আইন করিয়া পিতৃ-সম্পত্তিতে কন্যার সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

সেবার পয়লা বৈশাখ অপরাহ্নের ডাকে রামেশ্বরবাবুর চিঠি আসিল। পুরু অ্যান্টিক কাগজের খাম, পরিচ্ছন্ন অক্ষরে নাম-ধাম লেখা; খামটি হাতে লইতেই ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। লক্ষ্য করিয়াছি রামেশ্বরবাবুকে মনে পড়িলেই মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। ব্যোমকেশ সস্নেহে খামটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ‘অজিত, রামেশ্বরবাবুর বয়স কত আন্দাজ করতে পারো?’

বলিলাম, নবাবুই হবে।’ ব্যোমকেশ বলিল, ‘অত না হলেও আশি নিশ্চয়। এখনো কিন্তু ভীমরতি ধরেনি। হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট আছে।’

সন্তর্পণে খাম কাটিয়া সে চিঠি বাহির করিল। দু-ভাঁজ করা তকতকে দামী কাগজ, মাথায় মনোগ্রাম ছাপা। গোটা গোটা অক্ষরে জরার চিহ্ন নাই। রামেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন–

বুদ্ধিসাগরেষু,
ব্যোমকেশবাবু, আপনি ও অজিতবাবু আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। আপনার বুদ্ধি দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিবর্ধিত হোক; অজিতবাবুর লেখনী ময়ুরপুচ্ছে পরিণত হোক!
আমি এবার চলিলাম। যমরাজের সমান আসিয়াছে, শীঘ্রই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আসিবে। কিন্তু 'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়?' যমদূতেরা আমাকে ধরিবার পূর্বেই আমি বৈকুণ্ঠে গিয়া পৌঁছিব।। কেবল এই দুঃখ আগামী বিজয়ার দিন আপনাদের স্নেহাশিস জানাইতে পারিব না।
মৃত্যুর পূর্বে বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি দেখিবেন, আমার শেষ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। আপনার বুদ্ধির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।
বিদায়। আমার এই চিঠিখানির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন না। আপনি পাঁচ হাজার টাকা পাইলেন। কিনা তাহা আমি বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্য করিব।
পুনরাগমনায় চ।
শ্রীরামেশ্বর রায়

চিঠি পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। আমিও চিঠি পড়িলাম। নিজের মৃত্যু লইয়া পরিহাস হয়তো তাঁহার চরিত্রানুগ, কিন্তু চিঠির শেষের দিকে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। ...আমার শেষ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়.কোন ইচ্ছা?

আমরা তো তাঁহার কোনও শেষ ইচ্ছার কথা জানি না, চিঠিতে কিছু লেখা নাই। তারপর- পাঁচ হাজার টাকা পাইলেন কিনা...কোন্ পাঁচ হাজার টাকা? ইহা কি রামেশ্বরবাবুর নূতন ধরনের রসিকতা, কিংবা এতদিনে সত্যই তাঁহার ভীমরতি ধরিয়াছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, ‘চল, কাল সকালে রামেশ্বরবাবুকে দেখে আসা যাক। কোনদিন আছেন কোনদিন নেই।’

বলিলাম, ‘বেশ, চল। চিঠি পড়ে তোমীর কি মনে হয় না যে, রামেশ্বরবাবুর ভীমরতি ধরেছে?’

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ‘পিতামহ ভীষ্মের কি ভীমরতি ধরেছিল?’

সম্প্রতি ব্যোমকেশ রামায়ণ মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, হাতে কাজ না থাকিলেই মহাকাব্য লইয়া বসে। ইহা তাহার বয়সোচিত ধর্মভাব অথবা কাব্য সাহিত্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা বলিতে পারি না। অন্য মতলবও থাকিতে পারে। তবে মাঝে মাঝে তাহার কথাবাতায় রামায়ণ মহাভারতের গন্ধ পাওয়া যায়।

বলিলাম, ‘রামেশ্বরবাবু কি পিতামহ ভীষ্ম?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রামায়ণের দশরথের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি।’

বলিলাম, 'দশরথের তো ভীমরতি ধরেছিল।'

সে বলিল, 'হয়তো ধরেছিল। সেটা বয়সের দোষে নয়, স্বভাবের দোষে। কিন্তু রামেশ্বরবাবু যদি একশো বছর বেঁচে থাকেন ওঁর ভীমরতি ধরবে না।'

রামেশ্বরবাবুর পরিবারিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সংক্ষিপ্ত। কলিকাতার উত্তরাংশে নিজের একটি বাড়িতে থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুমুদিনীর বয়স এখন বোধ করি পঞ্চাশোর্ধ্বে, তিনি নিঃসন্তান। প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম সম্ভবত রামেশ্বরবাবু নিজের নামের সহিত মিলাইয়া কুশেশ্বর রাখিয়াছিলেন। কুশেশ্বরের বয়সও পঞ্চাশের কম নয়, মাথার কিয়দংশে পাকা চুল, কিয়দংশে টাকা। সে বিবাহিত, কিন্তু সন্তান-সন্ততি আছে কিনা বলিতে পারি না। তাহাকে দেখিলে মেরুদণ্ডহীন অসহায় গোছের মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী নলিনী শুনিয়াছি প্রেমে পড়িয়া একজনকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার সহিত রামেশ্বরবাবুর কোনও সম্পর্ক নাই। মোট কথা তাঁহার পরিবার খুব বড় নয়, সুতরাং অশান্তির অবকাশ কম। তাঁহার অগাধ টাকা, প্রাণে অফুরন্ত হাস্যরস। তবু সন্দেহ হয় তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের নয়।

০২. রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে

পরদিন বেলা ন'টার সময় রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম।

বাড়িটা সরু লম্বা গোছের; দ্বারের সামনে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরা বন্ধ দ্বারের কড়া নাড়িলাম।

অল্পক্ষণ পরে দ্বার খুললেন একটা মহিলা। তিনি বোধ হয়। অন্য কাহাকেও প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাই আমাদের দেখিয়া তাঁহার কলহোদ্যত প্রখর দৃষ্টি নরম হইল; মাথায় একটু আচল টানিয়া দিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'কাকে চান?'

রামেশ্বরবাবুর বাড়ির দু'টি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ না থাকিলেও তাঁহাদের দেখিয়াছি। ইনি কুশেখরের স্ত্রী; দৃঢ়গঠিত বেঁটে মজবুত চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

মহিলার চোয়ালের হাড় শক্ত হইল; তিনি বোধ করি দ্বার হইতেই আমাদের বিদায় বাণী শুনাইবার জন্য মুখ খুলিয়াছিলেন, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। মহিলাটি একবার চোখ তুলিয়া সিঁড়ির দিকে চাহিলেন, তারপর দ্বার হইতে অপসৃত হইয়া পিছনের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি নিশ্চয় রান্নাঘর, কারণ সেখান হইতে হাতা-বেড়ির শব্দ আসিতেছে।

সিঁড়ি দিয়া দু'টি লোক নামিয়া আসিলেন; একজন কুশেশ্বর, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিলাতি বেশধারী প্রবীণ ডাক্তার। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ডাক্তার বলিলেন, 'উপস্থিত ভয়ের কিছু দেখছি না। যদি দরকার মনে কর, ফোন কোরো।'

ডাক্তার মোটরে গিয়া উঠিলেন, মোটর চলিয়া গেল। আমরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি , কুশেশ্বর এতক্ষণ তাহা লক্ষ্য করে নাই; এখন ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইল। তাহার টাক একটু বিস্তীর্ণ হইয়াছে অবশিষ্ট চুল আর একটু পাকিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের বোধ হয় চিনতে পারছেন না, আমি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

কুশেশ্বর বিহ্বল হইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশ বক্সী! ও-তা-হ্যাঁ, চিনেছি বৈকি। বাবার শরীর ভাল নয়—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি হয়েছে?' কুশেশ্বর বলিল, 'কাল রাত্রে হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল। এখন সামলেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন? তা-তিনি তেতলার ঘরে আছেন– '

এই সময় রান্নাঘরের দিক হইতে উচ্চ ঠকঠক শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কড়া আওয়াজ; আমরা তিনজনেই সেইদিকে তাকাইলাম; রান্নাঘরের ভিতর হইতে একটি অদৃশ্য হস্ত কপাটের উপর সাঁড়াশি দিয়া আঘাত করিতেছে। কুশেশ্বরের দিকে চাহিয়া

দেখি তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। সে কাশিয়া গলা সাফ করিয়া বলিল, 'বাবার সঙ্গে তো দেখা হতে পারে না, তাঁর শরীর খুব খারাপ-ডাক্তার এসেছিলেন–'

ওদিকে ঠকঠক শব্দ তখন থামিয়াছে। ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'বুঝেছি। ডাক্তারবাবুর নাম কি?'

কুশেশ্বর আবার উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেন। চেনেন না? মস্ত হার্ট স্পেশালিস্ট।'

'চিনি না, কিন্তু নাম জানি। বিবেকানন্দ রোডে ডিসপেন্সারি।'

'হ্যাঁ'

'তাহলে রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না?'

'মানে-ডাক্তারের হুকুম নেই–কুশেশ্বর একবার আড়চোখে রান্নাঘরের পানে তাকাইল।

'কত দিন থেকে ওঁর শরীর খারাপ যাচ্ছে?'

শরীর তো একরকম ভালই ছিল; তবে অনেক বয়স হয়েছে, বেশি নড়াচড়া করতে পারেন। না, নিজের ঘরেই থাকেন। কাল সকালে অনেকগুলো চিঠি লিখলেন, তারপর রাত্তিরে হঠাৎ–'

রান্নাঘরের দ্বারে অধীর সাঁড়াশির শব্দ হইল; কুশেশ্বর অর্ধপথে থামিয়া গেল। . ব্যোমকেশ বলিল, টরে-টক্কা! আপনার স্ত্রী বোধ হয় রাগ করছেন। — চললাম, নমস্কার।'

ফুটপাথে নামিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি সদর দরজা বন্ধ হইয়া-গিয়াছে।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বিমানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেনের ডিসপেন্সারি বেশি দূর নয়। চল, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই।'

ভাগ্যক্রমে ডাক্তার সেন ডিসপেন্সারিতে ছিলেন, তিন-চারটি রোগীও ছিল। ব্যোমকেশ চিরকুট নাম লিখিয়া পঠাইয়া দিল। ডাক্তার সেন বলিয়া পাঠাইলেন-একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

আধা ঘণ্টা পরে রোগীদের বিদায় করিয়া ডাক্তার সেন আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার খাস কামরায় উপনীত হইলাম। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দিয়া সাজানো বড় ঘরের মাঝখানে বড় একটি টেবিলের সামনে ডাক্তার বসিয়া আছেন, ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু? আজ রামেশ্বরবাবুর বাড়ির সদরে আপনাদের দেখেছি না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। আমরা কিন্তু হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করাবার জন্য আসিনি, অন্য একটু কাজ আছে। আমার পরিচয়—'

ডাক্তার সেন হাসিয়া বলিলেন, 'পরিচয় দিতে হবে না। বসুন। কি দরকার বলুন।'

আমরা ডাক্তার সেনের মুখোমুখি বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। কাল তাঁর নববর্ষের শুভেচ্ছাপত্র পেলাম, তাতে তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। এমনি একটা সংশয় জানিয়েছিলেন; তাই আজ সকালে তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। এসে শুনলাম, রাত্রে তাঁর হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেলাম না, তাই আপনার কাছে এসেছি তাঁর খবর জানতে। আপনি কি রামেশ্বরবাবুর ফ্যামিলি ডাক্তার?'

ডাক্তার সেন বলিলেন, 'পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন। ত্রিশ বছর ধরে আমি ওঁকে দেখছি। ওঁর হৃদযন্ত্র সবল নয়, বয়সও হয়েছে প্রচুর। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প কষ্ট পাচ্ছিলেন; তারপর কাল হঠাৎ গুরুতর রকমের কন্নড়াবাড়ি হল। যাহোক, এখন সামলে গেছেন।'

'উপস্থিত তাহলে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই?'

'তা বলতে পারি না। এ ধরনের রুগীর কথা কিছুই বলা যায় না; দু' বছর বেঁচে থাকতে পারেন, আবার আজই দ্বিতীয় অ্যাটাক হতে পারে। তখন বাঁচা শক্ত।'

'ডাক্তারবাবু, আপনার কি মনে হয় রামেশ্বরবাবুর যথারীতি সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে?'

ডাক্তার কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আপনি যা ইঙ্গিত করছেন তা আমি বুঝেছি। এরকম ইঙ্গিতের সঙ্গত কারণ আছে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি রামেশ্বরবাবুকেই চিনি, ওঁর পরিবারের অন্য কাউকে সেভাবে চিনি না। কিন্তু আজ দেখেশুনে আমার সন্দেহ হল, ওঁরা বাইরের লোককে রামেশ্বরবাবুর কাছে ঘেষতে দিতে চান না।'

ডাক্তার বলিলেন, 'তা ঠিক। আপনি রামেশ্বরবাবুর ফ্যামিলিকে ভালভাবে চেনেন না। কিন্তু আমি চিনি। আশ্চর্য ফ্যামিলি। কারুর মাথার ঠিক নেই। রামেশ্বরবাবুর স্ত্রী কুমুদিনীর বয়স ষাট, অথর্ব মোটা হয়ে পড়েছেন; কিন্তু এখনো পুতুল নিয়ে খেলা করেন, সংসারের কিছু দেখেন না। কুশেশ্বরটা ক্যাবলা, স্ত্রীর কথায় ওঠেবসে। একমাত্র কুশেশ্বরের স্ত্রী লাবণ্যর ইশ-পর্ব আছে, কাজেই অবস্থগতিকে সে সংসারের কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কিন্তু বাড়িতে চাকর-বামুন নেই কেন?'

'লাবণ্য চাকর-বাকর সহ্য করতে পারে না, তাই সবাইকে তাড়িয়েছে। নিজে রাঁধতে পারে না, শুধু এটা হাবা কালা বামনী রেখেছে বাকি সব কাজ নিজে করে। কুশেশ্বরকে বাজারে পাঠায়।'

'কিন্তু কেন? এসবের একটা মানে থাকা চাই তো।'

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস, এসবের মূলে আছে নলিনী।'

'নলিনী। রামেশ্বরবাবুর মেয়ে?'

'হ্যাঁ। অনেক দিনের কথা, আপনি হয়তো শোনেননি। নলিনী বাড়ির সকলের মতের বিরুদ্ধে এক ছোকরাকে বিয়ে করেছিল, সেই থেকে তার ওপর সকলের আক্রোশ। সবচেয়ে বেশি। আক্রোশ লাবণ্যর। রামেশ্বরবাবু প্রথমটা খুবই চটেছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁর রাগ পড়ে গেল। লাবণ্যর কিন্তু রাগ পড়ল না। সে নলিনীকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চায় না, বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। পাছে রামেশ্বরবাবু চাকর-ব্যাকরকে দিয়ে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাই তাদের সরিয়েছে। রামেশ্বরবাবু বলতে গেলে নিজের বাড়িতে নজরবন্দী হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি হয় না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, 'হুঁ, পরিস্থিতি কতকটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, রামেশ্বরবাবু উইল করেছেন। কিনা। আপনি বলতে পারেন?'

ডাক্তার সেন সচকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'করেছেন। আমার বিশ্বাস তিনি উইল করে নলিনীকে সম্পত্তির অংশ দিয়ে গেছেন। আমি জানতাম না, কাল রাত্রে জানতে পেরেছি।'

'কি রকম?'

'কাল রাত্রি দশটার সময় রামেশ্বরবাবুর হার্ট-অ্যাটাক হয়; আমাকে ফোন করল, আমি গেলাম। ঘন্টাখানেক পরে রামেশ্বরবাবু সামলে উঠলেন। তখন আমি সকলকে খেতে পাঠিয়ে দিলাম। রামেশ্বরবাবু চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'ডাক্তার, আমি উইল করেছি। যদি পটল তুলি, নলিনীকে খবর দিও।' এই সময়ে লাবণ্য আবার ঘরে ঢুকাল আর কোন কথা হল না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'স্পষ্টই বোঝা যায় ওরা রামেশ্বরবাবুকে উইল করতে দিচ্ছে না, পাছে তিনি নলিনীকে সম্পত্তির অংশ লিখে দেন। উনি যদি উইল না করে মারা যান তাহলে সাধারণ সুরক্সিকু নিয়মে ছেলে আর শ্রী সম্পত্তি পোব, মেয়ে কিছুই পাবে না—ব্রামেশ্বরবাবুরর বাঁধা উকিল কে?'

ডাক্তার সেন বলিলেন, 'বাঁধা উকিল কেউ আছে বলে তো শুনিনি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ভাল কথা, নলিনীর সাংসারিক অবস্থা কেমন?'

ডাক্তার বলিলেন, 'নেহাত ছা-পোষা গোরস্ত। ওর স্বামী দেবনাথ সামান্য চাকরি করে, তিন-চারশো টাকা মাইনে পায়। কিন্তু অনেকগুলি ছেলেপুলে–'

অতঃপর আমরা ডাক্তার সেনকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। রামেশ্বরবাবুর পারিবারিক জীবনের চিত্রটা আরও পূর্ণাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু আনন্দদায়ক হইল না। বৃদ্ধ হাস্যরসিক, অন্তিমকালে সত্যই বিপাকে পড়িয়াছেন, অথচ তাঁহাকে সাহায্য করিবার উপায় নাই। ঘরের ঢেঁকি যদি কুমীর হয়, সে কি করিতে পারে?

০৩. রামেশ্বরবাবুর মৃত্যু-সংবাদ

দিন আষ্টেক পরে একদিন দেখিলাম, সংবাদপত্রের পিছন দিকের পাতার এক কোণে রামেশ্বরবাবুর মৃত্যু-সংবাদ বাহির হইয়াছে। তিনি খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার টাকা ছিল, তাই বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ দৈনিক পত্রের পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্যোমকেশ খবরের কাগজে কেবল বিজ্ঞাপন পড়ে, তাই তাহাকে খবরটা দেখাইলাম। আজ রমেশ্বরবাবুর নামোল্লেখে তাহার মুখে হাসি ফুটিল না, সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর পাশের ঘরে গিয়া টেলিফোনে কাহার সহিত কথা বলিল।

সে ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে?'

সে বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেনকে, পরশু রাত্রে রামেশ্বরবাবুর মৃত্যু হয়েছে। আবার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল, ডাক্তার সেন উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। ডাক্তার স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়েছেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কি সন্দেহ ছিল যে-?'

সে বলিল, 'ঠিক সন্দেহ নয়। তবে কি জানো, এ রকম অবস্থায় একটু অসাবধানত, একটু ইচ্ছাকৃত অবহেলা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রামেশ্বরবাবু মারা গেলে ওদের

কারুরই লোকসান নেই, বরং সকলেরই লাভ। এখন কথা হচ্ছে, তিনি যদি উইল করে গিয়ে থাকেন এবং তাতে নলিনীকে ভাগ দিয়ে থাকেন, তাহলে সে-উইল কি ওরা রাখবে? পেলেই ছিঁড়ে ফেলে দেবে।'

সেদিন অপরাহ্নে নলিনী ও তাহার স্বামী দেবনাথ দেখা করিতে আসিল।

নলিনীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; সন্তান-সৌভাগ্যের আধিক্যে শরীর কিছু কৃশ, কিন্তু যৌবনের অস্তলীলা দেহ হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। দেবনাথের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ; এককালে সুশ্রী ছিল, হাত তুলিয়া আমাদের নমস্কার করিল।

নলিনী সজলচক্ষে বলিল, 'বাবা মারা গেছেন। তাঁর শেষ আদেশ আপনার সঙ্গে যেন দেখা করি। তাই এসেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাদের সমাদর করিয়া বসাইল। সকলে উপবিষ্ট হইলে বলিল, 'রামেশ্বরবাবুর শেষ আদেশ কবে পেয়েছেন?'

নলিনী বলিল, 'পয়লা বৈশাখ। এই দেখুন চিঠি।'

খামের উপর কলিকাতার অপেক্ষাকৃত দুর্গত অঞ্চলের ঠিকানা লেখা। চিঠিখানি ব্যোমকেশকে লিখিত চিঠির অনুরূপ সেই মনোগ্রাম করা কাগজ। চিঠি কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত—

কল্যাণীয়াষু,

তোমরা সকলে আমার নববর্ষের আশীবাদ লইও। যদি ভালোমন্দ কিছু হয়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বক্সী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিও। ইতি—

শুভাকাঙ্খী

বাবা

পত্র রচনায় মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। কুশেশ্বর ও লাবণ্য যদি চিঠি খুলিয়া পড়িয়া থাকে, সন্দেহজনক কিছু পায় নাই। 'ভালোমন্দ কিছু হয়-ইহার নিগূঢ় অর্থ যে নিজের মৃত্যু সম্ভাবনা তাহা সহসা ধরা যায় না, সাধারণ বিপদ-আপদও হইতে পারে। তাই তাহারা চিঠি আটকায় নাই।

চিঠি ফেরত দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'শেষবার কবে রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

নলিনী বলিল, 'ছ-মাস আগে। পুজোর পর বাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম, সেই শেষ দেখা। তা বৌদি। সারাক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আড়ালে বাবার সঙ্গে একটা কথাও কইতে দিলে না।'

'বৌদির সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই?'

'সম্ভাব! বৌদি আমাকে পাশ পেড়ে কাটে।'

'কোন কারণ আছে কি?'

'কারণ আর কি! ননদ-ভাজ, এই কারণ। বৌদি বাঁজা, আমার মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলেপুলে হয়েছে, এই কারণ।'

'ডাক্তার সেনের সঙ্গে সম্প্রতি আপনাদের দেখা হয়েছে?

'সেন-কাকা কাল সকালে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বাবা নাকি উইল করে গিয়েছেন।'

'সেই উইল কোথায় আপনারা জানেন?'

'কি করে জানিব? বাবাকে ওরা একরকম বন্দী করে রেখেছিল। বাবা অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন, তোতলায় নিজের ঘর ছেড়ে বেরুতে পারতেন না; ওরা যক্ষির মত বাবাকে আগলে থাকত। বাবা যেসব চিঠি লিখতেন ওয়া খুলে দেখত, যে-চিঠি ওদের পছন্দ নয় তা ছিঁড়ে ফেলে দিত। বাবা যদি উইল করেও থাকেন তা কি আর আছে? বৌদি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, রামেশ্বরবাবু বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি যদি উইল করে গিয়ে থাকেন, নিশ্চয় এমন কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন যে সহজে কেউ খুঁজে পাবে না। এখন কাজ হচ্ছে ওরা সেটা খুঁজে পাবার আগে আমাদের খুঁজে বার করা।'

নলিনী সংগ্রহে বলিল, 'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু। বাবা যদি উইল করে থাকেন নিশ্চয় আমাদের কিছু দিয়ে গেছেন, নইলে উইল করার কোন মানে হয় না। কিন্তু এ অবস্থায় কি করতে হয় আমরা কিছুই জানি না–নলিনী কাতর নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিল।

এই সময় দেবনাথ গলা খাঁকারি দিয়া সর্বপ্রথম কিছু বলিবার উপক্রম করিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, 'একটা কথা মনে হল। শুনেছি উইল করলে দু'জন সাক্ষীর দস্তখত দরকার হয়। কিন্তু আমার শ্বশুর দু'জন সাক্ষী কোথায় পাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কথা যথার্থ; কিন্তু একটা ব্যতিক্রম আছে। যিনি উইল করেছেন তিনি যদি নিজের হাতে আগাগোড়া উইল লেখেন তাহলে সাক্ষীর দরকার হয় না।'

নলিনী উজ্জ্বল চোখে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, 'শুনলে? এই জন্যে বাবা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।–ব্যোমকেশবাবু, আপনি একটা উপায় করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চেষ্টা করব। উইল বাড়িতেই আছে, বাড়ি সার্চ করতে হবে। কিন্তু ওরা যাকে-তাকে বাড়ি সার্চ করতে দেবে কেন? পুলিসের সাহায্য নিতে হবে। ডাক্তার অসীম সেনকেও দরকার হবে। দু-চার দিন সময় লাগবে। আপনারা বাড়ি যান, যা করবার আমি করছি। উইলের অস্তিত্ব যদি থাকে, আমি খুঁজে বার করব।'

ব্যোমকেশ যখন সরকারী মহলে দেখাশুনা করিতে যাইত, আমাকে সঙ্গে লইত না। আমারও সরকারী অফিসের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগিত না।

দুই দিন ব্যোমকেশ কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল জানি না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'সব ঠিক হয়ে গেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী ঠিক হয়ে গেছে?'

সে বলিল, 'খানাতল্লাশের পরোয়ানা পাওয়া গেছে। কাল সকালে পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমরা রামেশ্বরবাবুর বাড়ি সার্চ করতে যাব।'

পরদিন সকালবেলা আমরা রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে পাঁচ-ছয় জন পুলিসের লোক এবং ইন্সপেক্টর হালদার নামক জনৈক অফিসার।

কুশেশ্বর প্রথমটা একটু লম্ফঝাম্প করিল, তাহার স্ত্রী লাবণ্য আমাদের নয়ন।বহ্নিতে ভস্ম করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ইন্সপেক্টর হালদার তাঁহাদের

এবং বিধবা কুমুদিনীকে একজন পুলিসের জিম্মায় রান্নাঘরে বসাইয়া তল্লাশ আরম্ভ করিলেন। ত্রিতল বাড়ির কোনও তলই বাদ দেওয়া হইল না; দুইজন নীচের তলা তল্লাশ করিল, দুইজন দ্বিতলে কুশেশ্বর ও লাবণ্যর ঘরগুলি অনুসন্ধানের ভার লইল, ব্যোমকেশ, ইন্সপেক্টর হালদার ও আমি তিনতলায় : রামেশ্বরবাবু তিনতলায় থাকিতেন, সুতরাং সেখানেই উইল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশি।

দুইটি ঘর লইয়া তিনতলা। ছোট ঘরটি গৃহিণীর শয়নকক্ষ, বড় ঘরটি একাধারে রামেশ্বরবাবুর শয়নকক্ষ এবং অফিস-ঘর। এক পাশে 'তাঁহাদের শয়নের পালঙ্ক, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার বইয়ের আলমারি প্রভৃতি। এই ঘর হইতে একটি সরু দরজা দিয়া স্নানের ঘরে যাইবার রাস্তা।

আমরা তল্লাশ আরম্ভ করিলাম। তল্লাশের বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন নাই। দুইটি ঘরের বহু আসবাব, খাট বিছানা টেবিল চেয়ার আলমারির ভিতর হইতে এক টুকরা কাগজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তল্লাশ করা হইল। তল্লাশ করিতে করিতে একটি তথ্য আবিষ্কার করিলাম; আমাদের পূর্বে আর একদফা তল্লাশ হইয়া গিয়াছে। কুশেশ্বর এবং তাহার স্ত্রী উইলের খোঁজ করিয়াছে।

ব্যোমকেশ আমার কথা শুনিয়া বলিল, 'হুঁ। এখন কথা হচ্ছে ওরা খুঁজে পেয়েছে কিনা।'

আড়াই ঘণ্টা পরে আমরা ক্লান্তভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া বসিলাম। টেবিলের এক পাশে একটি পিতলের ছোট্ট হামানদিস্তা ছিল, রামেশ্বরবাবু তাহাতে পান ছেঁচিয়া

খাইতেন; ব্যোমকেশবাবু সেটা সামনে টানিয়া আনিয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে, নিম্নতলে যাহারা তল্লাশ করিতেছিল তাহারা জানাইয়া গিয়াছে যে সেখানে কিছু পাওয়া যায় নাই।

ইন্সপেক্টর হালদার বলিল, 'তেতলায় নেই। তার মানে রামেশ্বরবাবু উইল করেননি, কিংবা ওরা আগেই উইল খুঁজে পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উইল করা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু—'

এই সময় ইন্সপেক্টর হালদার অলস। হস্তে গঁদের শিশির ঢাকনা তুলিলেন।

টেবিলের উপর কাগজ কলম লেফাফা পিন-কুশন গঁদের শিশি প্রভৃতি সাজানো ছিল, আমরা পূবর্বে টেবিল ও তাহার দেরাজগুলি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু গঁদের শিশির ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল।

কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ!

ব্যোমকেশ খাড়া হইয়া বসিল, 'কিসের গন্ধ! কাঁচা পেঁয়াজ! দেখি।'

গঁদের শিশি কাছে টানিয়া লইয়া সে গভীরভাবে তাহার ঘ্রাণ লইল। শিশি কাত করিয়া দেখিল, ভিতরে গাঢ় শ্বেতাভ পদার্থ দেখিয়া গঁদের আঠা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহাতে পেঁয়াজের গন্ধ কেন? কোথা হইতে পেঁয়াজ আসিল?

গদের শিশি হাতে লইয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল বসিয়া রহিল। নিশ্চলতার অন্তরালে প্রচণ্ড মানসিক ক্রিয়া চলিতেছে তাহা তাহার চোখের তীব্র-প্রখর দৃষ্টি হইতে অনুমান করা হয়। আমি ইন্সপেক্টর হালদারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। পেঁয়াজ-গন্ধী গঁদের শিশির মধ্যে ব্যোমকেশ কোন রহস্যের সন্ধান পাইল!

'ইন্সপেক্টর হালদার, দয়া করে একবার কুশেশ্বরের স্ত্রীকে ডেকে আনবেন?'

অল্পক্ষণ পরে লাবণ্য প্রতি পদক্ষেপে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া নিজের চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন। আপনাকে একটা প্রশ্ন করব।'

লাবণ্য উপবেশন করিল। তাহার চোয়ালের হাড় শক্ত, চক্ষে কঠিন সন্দিগ্ধতা। তিনজন অপরিচিত পুরুষ দেখিয়াও তাহার দৃষ্টি নরম হইল না।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আপনার শ্বশুরমশায় কি কাঁচা পেঁয়াজ খেতে ভালোবাসতেন?'

লাবণ্য চকিতভাবে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, তাহার মুখের বিদ্রোহ অনেকটা প্রশমিত হইল। সে বলিল, 'ভালোবাসতেন না, কিন্তু যাবার কিছুদিন আগে কাঁচা পেঁয়াজের ওপর লোভ হয়েছিল। ভীমরতি অবস্থা হয়েছিল, তার ওপর একটিও দাঁত ছিল না; হামানদিস্তায় পেঁয়াজ ছেঁচে তাই খেতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ও। মৃত্যুর কতদিন আগে পেঁয়াজের বাতিক হয়েছিল?'

লাবণ্য ভাবিয়া বলিল, 'দশ-বারো দিন আগে। চৈত্র মাসের শেষের দিকে।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনাদের মিছে কষ্ট দিলাম, সেজন্য ক্ষমা করবেন। চল অজিত, চলুন ইন্সপেক্টর হালদার। এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।'

কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাজ শেষ হইল কিছুই বুঝিলাম না, আমরা গুটি গুটি বাহির হইয়া আসিলাম। ফুটপাথে নামিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্সপেক্টর হালদার, আপনি চলুন আমাদের বাসায়। আপনার সঙ্গীদের আর দরকার হবে না।'

বাসায় পৌঁছিয়া সে আমাকে প্রশ্ন করিল, 'অজিত, নববর্ষে রামেশ্বরবাবু আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটা কোথায়?'

এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলাম, 'আমি তো সে-চিঠি আর দেখিনি। এইখানেই কোথাও আছে, যাবে কোথায়।'

আমাদের ব্যক্তিগত চিঠির কোনও ফাইল নাই, চিঠি পড়া হইয়া গেলে কিছু দিন যত্রতত্র পড়িয়া থাকে, তারপর পুঁটিরাম ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দেয়।

ব্যোমকেশ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল, 'দ্যাখো-খুঁজে দ্যাখো, চিঠিখানা ভীষণ জরুরী। রামেশ্বরবাবু তাতে লিখেছিলেন–আমার এই চিঠিখানির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন না। তখন ও-কথায় মানে বুঝিনি–'

ইন্সপেক্টর হালদার বলিলেন, 'কিন্তু কথাটা কি? ও-চিঠিখানা হঠাৎ এত জরুরী হয়ে উঠল কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলেন না! ওই চিঠিখানাই রামেশ্বরবাবুর উইল।'

'অ্যাঁ। সেকি?'

'হ্যাঁ। আজ গঁদের শিশিতে পেঁয়াজের রস দেখে বুঝতে পারলাম। রামেশ্বরবাবু অদৃশ্য কালি দিয়ে উইল লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।'

'কিন্তু—অদৃশ্য কালি–'

‘পরে বলব। অজিত, চারিদিকে খুঁজে দ্যখো, পুঁটিরামকে ডাকে। ও-চিঠি যদি না পাওয়া যায়, নলিনী আর দেবনাথের সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

পুঁটিরামকে ডাকা হইল, সে কিছু বলিতে পারিল না। ব্যোমকেশ মাথায় হাত দিয়া বসিল, তারপর পাংশু মুখ তুলিয়া বলিলল ‘থামো্‌, থামো। বাইরে খুঁজলে হবে না, মনের মধ্যে খুঁজতে হবে।’

ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া সে সিগারেট ধরাইল, কড়িকাঠের পানে চোখ তুলিয়া ঘন ঘন ধূম উদগিরণ করিতে লাগিল।

আমরাও সিগারেট ধরাইলাম।

পনরো মিনিট পরে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, ‘সেদিন আমি কোন বই পড়ছিলাম মনে আছে?’

বলিলাম, ‘কবে? কোনদিন?’

‘যেদিন রামেশ্বরবাবুর চিঠিখানা এল। পয়লা বৈশাখ, বিকেলবেলা। মনে নেই?’

মনের পটে সেদিনের দৃশ্যটি আকিবার চেষ্টা করিলাম। পোস্টম্যান দ্বারে ঠকঠক শব্দ করিল; ব্যোমকেশ তক্তপোশে পদ্মাসনে বসিয়া একটা মোটা বই পড়িতেছিল; কালী সিংহের মহাভারত, না হেমচন্দ্র-কৃত রামায়ণ?

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, ‘মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড। পিতামহ ভীষ্মের কথা উঠল মনে নেই?’

ছুটিয়া গিয়া শেলফ হইতে মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিলাম। পাতা খুলিতেই খামসমেত রামেশ্বরবাবুর চিঠি বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!-পুঁটিরাম, একটা আংটায় কয়লার আগুন তৈরি করে নিয়ে এস।’

০৪. রামেশ্বরবাবুর উইল

ব্যোমকেশের টেলিফোন পাইয়া ডাক্তার অসীম সেন আসিয়াছেন। নলিনী ও দেবনাথকে সঙ্গে লইয়া। ঘরের মেঝোয় আগুনের আংটা ঘরের বাতাবরণকে আরও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ চিঠিখানি সযত্নে হাতে ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিল–

'রামেশ্বরবাবু হাস্যরসিক ছিলেন, উপরন্তু মহা বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীর অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা তাঁর ছিলন। তিনি ছেলে আর পুত্রবধূর হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন।

'তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে, তখন তাঁর ইচ্ছা হল মেয়েকেও কিছু ভাগ দিয়ে যাবেন। কিন্তু মেয়েকে সম্পত্তির ভাগ দিতে গেলে উইল করতে হয়, বর্তমান আইন অনুসারে মেয়ের পিতৃ-সম্পত্তির ওপর কোনো স্বাভাবিক দাবি নেই। রামেশ্বরবাবু স্থির করলেন তিনি উইল করবেন।

'কিন্তু শুধু উইল করলেই তো হয় না; তাঁর মৃত্যুর পর উইল যে বিদ্যমান থাকবে তার স্থিরতা কি? কুশেশ্বর আর লাবণ্য সম্পত্তির ভাগ নলিনীকে দেবে না, তারা নলিনীকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তারা নলিনীকে বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, সর্বদা

রামেশ্বরবাবুকে আগলে থাকে; তিনি যে-সব চিঠি লেখেন তা খুলে তদারক করে, চিঠিতে সন্দেহজনক কোনো কথা থাকলে, চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

'তবে উপায়? রমেশ্বরবাবু বুদ্ধি খেলিয়ে উপায় বার করলেন। সকলে জানে না, পেঁয়াজের রস দিয়ে চিঠি লিখলে কাগজের ওপর দাগ পড়ে না, লেখা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ওই অদৃশ্য লেখা ফুটিয়ে তোলবার উপায় আছে, খুব সহজ উপায়। কাগজটা আগুনে তাতালেই অদৃশ্য লেখা ফুটে ওঠে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন ম্যাজিক দেখানোর শখ ছিল; অনেকবার সহপাঠীদের এই ম্যাজিক দেখিয়েছি।

'রামেশ্বরবাবু এই ম্যাজিক জানতেন। তিনি আবদার ধরলেন, কাঁচা পেঁয়াজ খাবেন। তাঁর ছেলে-বৌ ভাবল ভীমরতির খেয়াল; তারা আপত্তি করল না। রামেশ্বরবাবু হামানদিস্তায় পান ছেচে খেতেন; তাঁর পান খাওয়ার শখ ছিল, কিন্তু দাঁত ছিল না। পেঁয়াজ হাতে পেয়ে তিনি হামানদিস্তায় থেতো করলেন; গঁদের শিশি থেকে গদ ফেলে দিয়ে তাতে পেঁয়াজের রস সঞ্চয় করে রাখলেন। কেউ জানতে পারল না। তাঁর প্রাণে হাস্যরস ছিল; এই কাজ করবার সময় তিনি নিশ্চয় মনে মনে খুব হেসেছিলেন।

'পয়লা বৈশাখ তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখতেন। এবার নববর্ষ সমাগত দেখে তিনি চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। আমাকে প্রতি বছর চিঠি লেখেন, এবারও লিখলেন; তারপর চিঠির পিঠে অংশ পেঁয়াজের রস দিয়ে উইল লিখলেন। এই সেই চিঠি আর উইল।'

ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া সাবধানে চিঠি বাহির করিল, চিঠির ভাঁজ খুলিয়া দুই হাতে তাহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আংটার আগুনের উপর ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। আমরা শ্বাস রুদ্ধ করিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলাম।

এক মিনিট রুদ্ধশ্বাসে থাকিবার পর আমাদের সমবেত নাসিকা হইতে সশব্দ নিশ্বাস বাহির হইল। কাগজের পিঠে বাদামী রঙের অক্ষর ফুটিয়া উঠিতেছে।

পাঁচ মিনিট পরে কাগজখানি আগুনের উপর হইতে সরাইয়া ব্যোমকেশ একবার তাহার উপর চোখ বুলাইল, তারপর তাহা ডাক্তার সেনের দিকে বাড়াইয়া বলিল, 'ডাক্তার সেন, রামেশ্বরবাবু আপনাকে যে উইলের কথা বলেছিলেন, এই সেই উইল। —পড়ুন, আমরা সবাই শুনব।'

ডাক্তার সেন একবার উইলটা মনে মনে পড়িলেন, তাঁহার মুখে স্মরণাত্মক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর তিনি গলা পরিষ্কার করিয়া মন্দ্রকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিলেন–

নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আমি শ্রীরামেশ্বর রায়, সাকিম, ১৭ নং শ্যামধন মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, অদ্য সুস্থ শরীরে এবং বাহাল তবিয়াতে আমার শেষ উইল লিখিতেছি। অবস্থা গতিকে উইলের সাক্ষী যোগাড় করা সম্ভব হইল না, তাই নিজ হস্তে আগাগোড়া উইল লিখিতেছি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ বা মস্তিষ্ক বিকার হয় নাই, ডাক্তার অসীম সেন তাহার সাক্ষী। এখন আমার শেষ ইচ্ছা অর্থাৎ Last will and testament লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতায় আমার যে আটটি বাড়ি আছে এবং ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে, তন্মধ্যে হ্যারিসন রোডের বাড়ি এবং নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমার কন্যা শ্রীমতী নলিনী পাইবে। আমার স্ত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী যাবজ্জীবন আমার শ্যামপুকুরের বাড়ির উপস্বত্ব ভোগ করবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওই বাড়ি আমার কন্যা নলিনীকে আসিবে। আমার বাকী যাবতীয় সম্পত্তি, ছয়টি বাড়ি এবং ব্যাঙ্কের টাপা পাইবে আমার পুত্র শ্রীকুশেশ্বর রায়। স্বনামধন্য সত্যান্বেষী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী ও বিখ্যাত ডাক্তার অসীম সেনকে আমার উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি; তাঁহারা যথানির্দেশ ব্যবস্থা করিবেন এবং আমার এস্টেট হইতে প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন।

তারিখ পয়লা বৈশাখ

১৩৬০

স্বাক্ষর বকলম খাস

শ্রীরামেশ্বর রায়

উইল পড়া শেষ হইলে কেহ কিছুক্ষণ কথা কহিল না, তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলাম। নলিনী গলদশ্রু নেত্রে ছুটিয়া আসিয়া ব্যোমকেশের পদধূলি লইল। গদগদ স্বরে বলিল, 'আপনি আমাদের নতুন জীবন দিলেন।'

ব্যোমকেশ করুণ হাসিয়া বলিল, তা তো দিলাম। কিন্তু এ উইল কোর্টে মঞ্জুর করানো যাবে কি?'

ইন্সপেক্টর হালদার আসিয়া সবেগে ব্যোমকেশের করমর্দন করিলেন, বলিলেন, 'আপনি ভাববেন না। ওরা উইল contest করতে সাহস করবে না। যদি করে আমি সাক্ষী দেব।'

ডাক্তার অসীম সেন বলিলেন, 'আমিও।'